বিনিরা যখন বন্ধু
অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

বিনি, আজকে ফিস্ট করবি?
বিনি বেশ অবাক হয়ে মিতিনের দিকে চেয়ে আছে। কথাটা বোধহয় ঠিক বুঝতে পারেনি। মিতিন আবার বল্লো কথাটা। এবার বিনির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্লো। ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। দুদিন মেঘলা কেটেছে। আজকে একদম চারদিক ভাসিয়ে রোদ উঠেছে। ঝল্‌মল্ করছে চারপাশ। যাকে বলে শীত কালের সোনা ঝরা দিন। মিতিন উৎসাহে ফুটছে। আজকে দিনটা বেশ কাটবে তাহলে। গতকাল রাত পর্যন্ত তার খুব মন খারাপ লাগছিলো। পঁচিশে ডিসেম্বর সবাই আনন্দ করবে, শুধু মিতিনই কিছু করতে পারবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারও আনন্দ কিছু কম হবে না। বাবা - মা বাড়ি না থেকে ভালোই হয়েছে। থাকলেই এরকম কিছু করতে পারতো না মিতিনরা। মিতিনের তিন বন্ধু বিনি তিত্‌লি আর বিলু বাবা মাকে ভীষণ ভয় পায়। বাবা মা বাড়ি থাকলে ওরা কিছুতেই আসতে চায় না। এতো ছোটবেলা থেকে দেখছে, তবুও ওদের ভয় যায় না। ওদের মধ্যে বিনির সঙ্গে মিতিনের বন্ধুত্বটা সবচেয়ে পুরোনো। বিলু আর তিতলির সঙ্গে মিতিনের পরিচয় ক্লাস ফাইভে পড়তে। তাও প্রায় ছ'বছর হয়ে গেলো। তখন মিতিনের খুব মন খারাপ হতো। বাবা মা দু'জনেই রিপোর্টার। রোজই সকালে বেরিয়ে যেতে হয় দুজনকে, ফিরতে রাত হয়ে যায় তখনও হতো। বাড়িতে থাকতো আর সন্ধ্যা মাসি। আস্তে আস্তে মিতিনের সেই মন খারাপ কমিয়ে দিলো বিনিরা। ছোট বেলায় মিতিনের পায়ে পোলিও হয়েছিলো। তখন স্কুলের সঙ্গে পরী(া দেওয়া ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক ছিলো না। আর পায়ের জন্য বাইরে যাওয়াও সম্ভব হয়নি মিতিনের প(ে। শুধু বিনিরা তিন জন আসত তার কাছে। ক্লাস সেভেন এইট থেকে মিতিনি নিয়মিত স্কুলে যেতে শু করেছে। যদিও স্কুলটা তার একদম ভালো লাগত না। এখনও লাগে না। আসলে বিনিদের ছাড়া আর কাউকেই মিতিনের বন্ধু ভাবতে ভালো লাগে না। পায়ের অসুবিধাটা এখন আর তেমন নেই তার, তবুও কোনও কোচিং -এ পড়তে যায় না মিতিন। সবাই তাকে বাড়িতেই পড়াতে আসে। মিতিনের কোথাও যাবার নেই। দাদুর আমলের এই বিশাল তিনতলা বাড়িতেই তার যা কিছু। মাঝে মাঝে ভীষণ পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে মিতিনের। বিনিকে সে বলেওছে সেই কথা। বিনি বারন করে। তারপরে নানা কথায় চাপা পড়ে যায় মিতিনের ইচ্ছেটা। বিনিটার কাছে মিতিনের মন খারাপের সবরকম ওষুধ আছে। ওর সঙ্গে কথা বলার কিছু(নের মধ্যেই মন খারাপ উধাও হয়ে যায়।সেবার যখন মা একরাত বাড়ি ফিরতে পারলো না, খুব ঝড়বৃষ্টিও হচ্ছিলো টেলিফোনে লাইনও পায়নি তাই মাখবরও দিতে পারেনি। বাবা আগের দিন মাকে ওখানে যেতে বারণ করেছিলো। সেই নিয়ে ঝগড়াও হয়েছিলো দুজনের। মার জন্য সারারাত জেগে বসেছিলো মিতিন। বাবা --অকাতরে ঘুমিয়েছিলো। ঘুমানোর আগে বাবাকে মা কথা জিজ্ঞেসা করতেই চিৎকার করে বলে উঠেছিলো --- 'জাহান্নামে যাক, আমাকে দয়া করে একটু ঘুমোতে দে।'

সিঁটিয়ে গিয়েছিলো মিতিন। সারারাত কেঁদেছিলো ততদিনে মা - বাবার সম্পর্ক নিয়ে হালকা একটা ধারনা হয়ে গেছে তার। এখন সে অনেকটাই বোঝে। দুজনের মধ্যেই বাসা বেঁধে আছে চাঁই চাঁই কম্‌প্লেক্স। তাই দুজনেই একে অন্যের দুর্বল জায়গায় খোঁটা দিয়ে সান্ত্বনা পেতে চায়। মার ধারণা তার অবহেলার জন্যই মিতিন পোলিওর শিকার হয়েছিলো। সে ধারণা অনেকটা সত্যিও বটে। আর বাবার কম্‌প্লেক্স নিতান্ত বস্তুগত। শুধু চাকরীটা ছাড়া বাবার আর কিছুই নেই। এই বাড়ি এবং বাড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় আয় মায়ের।দাদুর সূত্র ধরেই আজ তা মায়ের। এমনকি বাবার চাকরীটাও দাদুরই অবদান। মেয়ের পছন্দের ছেলেটি অনাথ এবং বেকার। বাবার অনাথ অবস্থা ঘোচাবার সবথেকে ভালো বন্দোবস্তটাই তিনি করেছিলেন। কিন্তু বাবার এলেমে রিপোর্টারের থেকে আরো উঁচুতে ওঠা কুলোয়নি। মা যেখানে নিজের (মতাতেই এডিটর হয়ে গেছে, বাবা সেখানে আজও নিতান্ত এক জন স্টাফ রিপোর্টার। বছর দুয়েক আগেও মিতিনের খুব ভয় লাগতো -- বাবা - মা যদি আলাদা হয়ে যায় তা হলে মিতিন কি করবে? এখন আর ঐ ভয়টা করে না।সে বুঝে গেছে বাবা - মা আলাদা হবে না। কারণটা খুব স্পষ্ট না হলেও তার মনে হয়, এরা বোধহয় পরস্পরের পরিপূরক। এক জন আরেকজনের দুর্বল জায়গায় নিজের নিজের জয় খুঁজে পায়। ওখানেই নির্ভরতা তৈরী হয়। এত শক্ত কথাটা কিভাবে যে মিতিন ভেবে ফেল্‌লো সেটা সে নিজেই বুঝতে পারে না। বিনির সঙ্গে গল্পের বই আর সিনেমা নিয়ে গল্প করতে করতে আরও কতো গভীর কথা বেরিয়ে আসে মিতিনের মুখ থেকে। সেবারের ঝড় জলের রাত কাটিয়ে মা যখন ভোর বেলা ফিরলো মিতিন তখন সবে ঘুমিয়েছে। আচম্‌কা একটা ভাঙ্গার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেছিলো ওর।পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে বাবা ভেনাসের কাঁচের মুর্তিটা আঁচড়েভেঙে ফেলেছে। মা সামনেই দাঁড়িয়ে। কেমন একটা গা ছমছমে হাসি খেলে বেড়াচ্ছে মায়ের সারা মুখে। দৌড়ে নিজের ঘরে চলে এসেছিলো মিতিন। তার সারা শরীর তখন কাঁপছে। সেদিনও বাবা - মা বেরিয়ে যাবার পর বিনি এসেছিলো। বিনি তাকে কোনও কথাই বলতে দেয়নি। শুধু একটা নদীর ধারে নিয়ে গিয়েছিলো। সেখানে সুজাতা আর তার ছেলে বুদ্ধাদেবকে পায়েস খাইয়েছিলো। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেজা মাটির গন্ধের সঙ্গে ঐ পায়েসের গন্ধটা মিতিনের সব মনখারাপ শুষেনিয়েছিলো। মিতিন টের পেয়েছিলো ওর ভেতরটা কেমন যেন শান্ত হয়ে গেছে। বিনির সঙ্গে অনেক(ণ বসেছিলোওখানে।

তিতলি আর বুলাকে খবর দিয়ে এসে মিতিন দেখলো সন্ধ্যা মাসির সকালের কাজ সারা হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যা মাসি নাতনির বাড়ি যাবে বেড়াতে। তাই এতো তাড়াহুড়ো। মিতিনতো আর ছোট্টটি নেই, যে দিনভর তাকে পাহারা দিতেহবে সন্ধ্যা মাসির! বিকেল বিকেল ফিরবো বলে বেরিয়ে গেলো সন্ধ্যা মাসি। সবে এগারোটা বেজেছে। এখন ও অনেকসময় আছে। রান্না ঘরে মিতিন দ্রুত দেখে নিচ্ছিলো কি কি রান্না আছে। মাংস, ডাল, আছেও বেশ পরিমান মতো। ওদের চার জনের হয়ে যাবে। রাতে কি কেউ আসবে? না হলে এতটা করে রান্না তো করে না সন্ধ্যা মাসি। যাই হোক আকে মিতিন দের পিকনিকটা তো হয়ে যাক। পরে একটা কিছু বানিয়ে বলে দিলেই হবে। বলবে বেড়ালে মুখ দিয়েছিলো বলে ফেলে দিয়েছে মিতিন। অথবা অন্য একটা কিছু।

আজ ব্যাঙ্কও ছুটি বলে দোতালাটা খাঁ খাঁ করছে। মিতিনের দাদুর সময় থেকেই এ বাড়ির একতলায় দো কানঘর আর দোতালায় ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ঘরে ফিরে এসে মিতিন দেখলো বিনি আজকের ফিস্টের জন্য তৈরী হচ্ছে। গোলাপী রং - এর লঙ্ স্কার্টের ওপর আকটা হাইনেক সাদা সোয়েটার পড়েছে। কোকড়া চুলগুলো খোলা। 'ঠোঁটে ম্যাজেন্ডা শেড এর লিপস্টিক ভারি মিষ্টি লাগছে ওকে। বিনি সবসময়ই সুন্দর করে সেজে থাকে। মিতিনের তো ইচ্ছেই করে না সাজতে। এ জন্য বিনি আর তিতলির খুব বকেও ওকে। চুলটা শেষ বারের মতো আচরে বিনি বল্‌লো--

তাড়াতাড়ি চান করে নে মিতিন। বিলু আর তিতলি এ(ুনি চলে আসবে।
--হ্যাঁ, এই তো যাচ্ছি। বিনি, রান্না যা আছে তা দিয়ে আমাদের চারজনের হয়ে যাবে।
--কিন্তু কাকিমা যদি পরে তোকে বকে?
মিতিন বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে হেসে উঠ্লো। বললো--
''তখন তোরা তো আছিস!''
অনেক(ণ ধরে চান সারলো মিতিন। মাথায় শ্যাম্পু দিলো। মায়ের কোন বন্ধু বিদেশ থেকে এনে দিয়েছে শ্যাম্পুটা। ভীষণ সুন্দর গন্ধ। চুলটাও ভীষণ মোলায়েম হয়ে যায়। হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুলটা শুকিয়ে নিলো মিতিন।প্যারালাল কাটন ট্রাউজারটার ওপর লাল রঙের টপটা পরলো। বিনি জোর করে পারফিউমও ছিটিয়ে

দিলো। তিতলি আর বিলুও এসে গেছে। বিলুটা খুব লাজুক। তবু আজ মিতিনকে বল্‌লো --''দা ন দেখাচ্ছেরে তোকে।''
দুপুরের খাওয়ার কথা বলতেই তিতলি বলে উঠ্‌লো--

''ওসব চালাকী ছাড়ো মিতিন। তৈরী রান্না খেয়ে আবার ফিস্ট কি? আমরাই রান্না করবো।''
বিনি একই সুর গাইছে--
''ঠিকই বলেছিস। তাছাড়া সারা বছর ধরে আমরা শীতকালের এই ফিস্টটার জন্য অপে(া করি। এই একটা দিনই তো নিজেরা রান্না করি। প্রতিবারই তা-ই হয়। এবারই বা অন্যরকম হবে কেনো?
বিলুও ফুট কাটলো--
''তোরা রাঁধতে না চাস আমাকে বলতেপারিস। এমন অসাধারণ কুক ভূভারতেপাবি না।''
মিতিন এই ভয়টাই পাচ্ছিলো। এরা যা পাগল সবসময়ই বলবে ''নিজেরা রান্না করব।'' মিতিন একটু চিন্তিত মুখে বললো-- তাহলে তো দেখতে হয়, রান্না করার মতো কি কি আছে? তোরাই বল্‌ মেনু কি হবে?
বিলু ফোড়ন কাটলো--
''খিচুরি, বেগুন ভাজা, পাঁপড় ভাজা আর চাটনী। কি খারাপ বল্‌লাম?''
বিনি আর তিত্‌লি একসঙ্গে বলে উঠ্‌লো -- 'দা ন' মিতিনও সুর মেলালো -- ''হ্যাঁ সেটাই ভালো। এগুলো সবই বাড়িতে আছে। ফ্রিজে মাছও আছে। মাছ ভাজাও করি। তাহলে ফিস্টটা আর নিরামিষ থাকে না।''
তিত্‌লি বলে উঠ্‌লো-- ''ঠিক বলেছিস, তানাহলে খাবার সময় মনে হতো কোনও আশ্রমে বসে খাচ্ছি।''
বিলু মুকিয়ে ছিলো তিতলির পেছনে লাগার জন্য। বল্‌লো --''ওই জন্যই তোর ধর্ম কর্ম হবে না। তিতলি।
আজকাল তোর গা দিয়ে কেমন একটা মেছো গন্ধ বেরোয়।''
তিতলি বিলুর মাথায় একটা গাট্টা মারলো। মিতিন তাড়া লাগালো।--
''চল চল্‌ দেখি গিয়ে রান্না ঘরের অবস্থা। প্রায় একটা বাজে। 'রান্নাটা এখনই বসিয়ে দিই।''
তিতলি আবার বাদ সাধলো। বললো -- নো রান্নাঘর প্লিজ। রান্না আর খাওয়া দুটোই বাগানে।''

বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ওরা রান্নার সাজ সরঞ্জাম বাগানে নিয়ে এলো। বিলু দুবালতি জলের যোগাড় করে ফেল্‌লো। সন্ধ্যামাসি ভাগ্যিস কালই স্টোভটা পরিস্কার করে রেখেছিলো। আসলে কোনও মাসেই মিতিনদের গ্যাসটাঠিক সময় বুক করে ওঠা হয না। গ্যাস ফুরোলে সবএচযে বেশি কিপদে পড়তে হয় সন্ধ্যা মাসিকেই। তাই সন্ধ্যামাসি স্টোভের ব্যবস্থা করে রাখে। সন্ধ্যামাসির কাছ থেকে মিতিন রান্নার পাশাপাশি স্টোভ জ্বালানোটাও শিখে নিয়েছে। আজও স্টোভটা ধরালো মিতিনই। প্রথমেই ও চাটনিটা করে নিয়েছে। কারণ গরম চাটনি খাওয়া যায় না। ওরা খেতেখেতে চাটনী ঠান্ডা হয়ে যাবে। বিনির খিছুড়িও হয়ে গেছে। তিত্‌লি ভাজাগুলো করে ফেলছে চটপট। বছরের এইরকমকয়েকটা দিনের দিকে চেয়ে থাকে মিতিনরা। যেমন সরস্বতী পুজোর আগের দিনের বিকেলটা দুপুর থেকেই কাজ সুহয়ে যায় ওদের। ঘরময় বাহারী আল্পনা দেওয়া, রঙ বেরঙের কাগজের শিকলি করা, থার্মোকলের কা কার্য -- কী না করে ওরা? খুব মজা হয়। মা এই ধরনের কাজগুলো খুব পছন্দ করে। খুব প্রশংসাও করে মিতিনের। বিনিরাবারন করে দেয় যেন মিতিন তাদের নাম না করে। মিতিনের খুব খারাপ লাগে মা তার একার প্রসংশা করে বলে। অবশ্য মাকে না বল্‌লে মা কি করেই বা জানবে?

বিনি কাউগাছটার ধারে রোদের দিকে পিঠ দিয়ে বসেছে। তিত্‌লি একদম গাছটার গোড়ায় হেলান দিয়েছে। বিলু একমনে মাউথঅর্গান বাজিয়ে চলেছে। মিতিন তালি দিচ্ছিলো তালে তালে ---' ....হারে রে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে ''খুব ভালো লাগছে শুনতে। আজকের এই ফিস্টটার জন্যই যেন এই গানটা তৈরী হয়েছে। সাড়ে তিনটে বেজে গেলো খাওয়া দাওযা মিটতে মিটতে। তবুও তাড়াতাড়িই হয়েছে বলতে হবে। শীতের বেলা বড্ড কম সময় দেয় ।মিতিনদের কাছে আর খুব বেশি হলে ঘন্টা দেড়েক সময় আছে। প্রতিটা মুহূর্তকেই যেন আস্টেপৃষ্টে উপভোগ করছিলে া মিতিন কান পেতে শুনলো কোথাও যেন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে তিতলি। কেমন যেন নেশা ধরা চারপাশ। ভাগ্যিস বিনির কথা মতো বাসন গুলো আগেই দুয়ে, জাযগার জিনিস জায়গাতে রেখে এসেছে ওরা আজও। আজও হয়তো মাদের বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হবে। কোথায় যেন পার্টিতে যাবার কথা আছে। অন্যদিনের মতো আজও সন্ধ্যা মাসি বলবে---

শুয়ে পড়ো মিতিন। মা বাবার আসতে দেরি হবে.
--এই কথাটায় মিতিন প্রত্যেকবার নতুন ভাবে টের পায় বাবা - মার জীবন যাপনের সঙ্গে তার প্রত্য(কোন যোগনেই। মন খারাপের ঘোরটোপটা রোজই একবার করে গিলে খায় ওকে। আজকে দিনটা বেশ ভালো কেটেছে। আজকে সন্ধ্যামাসি ঐ কথাটা বলার আগেই ঘুমিয়ে পড়বে মিতিন!

গল্পে - গানে - মাউথ অর্গানের সুরে চুপ করে শুয়ে তাকায় - শুকনো পাতার বিচিত্র শব্দে কখন যে বেলা মরে এলো টেরই পেলো না ওরা। কলিং বেলের কর্কশ শব্দটা বলে দিল- সময় শেষ। একটা শব্দ বদলে দেয় কতো কিছু! শব্দটা শোনা মাত্র সব ওলোটপালোট হযে গেলো -- বিনিটা এখন মিতিনের ছোটবেলার এক চোখ কানা পুতুল --তিতলিকে এক ঝলক দেকেই বোঝা যাচ্ছে ওটাএকটা পুরনো রেডিও .....আর বাবা সেই ছোট বেলায় ওকটা মাউথ
অর্গান দিয়েছিলো -- সেটাই বিলু। আর এত্‌নের নদীর পাশে রাখা বাগানটা হয়ে গেছে মিতিনদের ছাদটা ...জলের ট্যাঙ্কের পাশে রাখা কয়েকটা বনসই আর ক্যাক্টাস। নাম না জানা বনস্পতি হয়ে ছায়া দোলাচ্ছিলো!! কলিংবেল তত্‌ণে অধের্য হয়ে উঠেছে, বার বার বেজে যাচ্ছে। মিতিনকে চোখের জল আটকাতেই হবে, দরজাটা খুলেদিয়ে নিজের ঘরে বন্দী হতে হবেই। বিনি, তিতলি আর বিলুকে সঙ্গে নিয়ে ছাদের দরজা বন্ধ করতে করতে মিতিনেরমনে হলো, বনসাই আর ক্যাক্টাস গুলো যেন বলে উঠ্‌লো--''মন খারাপ করিসনা মিতিন। তোর কষ্ট কি -- বিনিরা যখন বন্ধু!